একক 15 ❑ জীবাশ্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা

গঠন

15.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

15.2 জীবাশ্মের সংজ্ঞা

15.3 জীবাশ্ম চর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

15.3.1 পুরাউদ্ভিদবিদ্যার ইতিহাস

15.4 জীবাশ্মবাহী শিলার প্রকৃতি

15.5 অশ্মীভবনের ধরন ও জীবাশ্মের প্রকার

15.6 জীবাশ্মীকরণ পদ্ধতি ও সংরক্ষণের শর্তসমূহ

15.7 জীবাশ্মের নামকরণ

15.8 জীবাশ্ম থেকে জীবদেহের পুনর্গঠন

15.9 জীবাশ্ম পরীক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি

15.10 জীবাশ্মের গুরুত্ব

15.11 সারাংশ

15.12 প্রশ্নাবলি ও উত্তরমালা

15.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

পৃথিবীতে আদিম প্রাণের চিহ্নই জীবাশ্ম বা ফসিল (fossil)। এগুলি যেন সুপ্রাচীন পৃথিবীর আত্মকথার এক একটি পাতা। জীবাশ্মবাহী পাথরগুলো হল হারিয়ে যাওয়া অতীত ইতিহাসের সাক্ষী। এগুলি একদিকে যেমন বলে দেয় উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের উৎপত্তি অবলুপ্তি কিংবা ক্রমবিকাশের কথা, তেমনি জানতে সাহায্য করে সমুদ্র, মহাদেশ, মেরুপ্রদেশের প্রাচীন অবস্থান কেমন ছিল। এমনকি, প্রাচীন পৃথিবীর বিভিন্ন সময়ে পরিবেশের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কের অনেক তথ্য জীবাশ্ম থেকে পাওয়া যায়।

উদ্দেশ্য : জীবশ্ম সম্পর্কে মানুষ চিরকৌতূহলী। প্রাচীন পৃথিবীর হারিয়ে যাওয়া জীবনের অনুসন্ধানে এখন প্রধান সহায় হল জীবাশ্ম। এই এককটি পাঠ করে আপনারা জীবাশ্মের সংজ্ঞা, প্রকার, এদের নামকরণ, জীবাশ্মীকরণের পদ্ধতি এবং জীবশ্মের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত হবেন।

15.2 জীবাশ্মের সংজ্ঞা

বিভিন্ন প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে াটির নীচে চাপা পড়া প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহাবশেষকে 'fossil' বা জীবাশ্ম বলা হয়। ফসিল কথাটির উৎপত্তি হয়েছে লাতিন কথা 'ফসিলিস' (fossilis) থেকে যার মানে হল খুঁড়ে বার করা। তাই

রোমান সাম্রাজ্যের সময় থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত জীবাশ্ম বলতে বোঝাত যা কিছু মাটি খুঁড়ে পাওয়া যেত তাকেই। এখন অবশ্য জীবাশ্ম বলতে ভূতাত্ত্বিক যুগের প্রাণের চিহ্নকেই বোঝায় যার মধ্যে পড়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ ও তাদের জৈবিক কর্মের চিহ্ন। জৈবিক কর্মের চিহ্ন বলতে আদিম প্রাণীর পায়ের ছাপ, সুড়ঙ্গ বা গর্ত, চলাফেরার দাগ এবং দৈহিক বিক্রিয়াজাত পদার্থ ইত্যাদিকে বোঝায়।

বিজ্ঞানী শফ্ (Schopf, 1975) জীবাশ্মকে হোলোসিন (holocene) ভূস্তরীয় কাল সারণীর নবীনতম উপযুগ যা আজ থেকে 10,000 বছর অতীতকে বোঝায় বা তার থেকে বেশি প্রাচীন প্রাণের অস্তিত্বের প্রামাণ্য চিহ্ন হিসেবে বর্ণনা করেছেন। পুরাউদ্ভিদবিদ স্টুয়ার্ট ও রথওয়েল (Stewart ও Rothwell, 1992) জীবাশ্মকে প্রাচীন প্রাণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ বলে অভিহিত করেছেন। এখানে উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং তাদের জৈবিক কর্মের চিহ্নকে পরোক্ষ প্রমাণ হিসেবে মনে করা হয়।

অনেক বিজ্ঞানী চার হাজার খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত সময়কে জীবাশ্মের সীমারেখা হিসেবে মনে করেন। পরবর্তী কালের জীবাশ্মকে পরাজীবাশ্ম (subfossil) বলা যেতে পারে। এদের নিয়ে গবেষণা কিছুটা জীববিদ্যা, কিছুটা নৃতত্ত্ব (anthropology) বা প্রত্নতত্ত্বের (archaeology) আওতার মধ্যে পড়ে।

15.3 জীবাশ্মচর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

জীবাশ্মের বিজ্ঞানভিত্তিক চর্চার শুরু হয় ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। ব্রিটেনের উইলিয়াম স্মিথ (William Smith, 1769-1839) এবং ফ্রান্সের ব্যারন কুভিয়ের (Gorges Baron Cuvier, 1769-1832) সর্বপ্রথম জীবাশ্মচর্চা শুরু করেন। স্মিথ সর্বপ্রথম শিলাস্তর বিন্যাসে (stratigraphy) জীবাশ্মের প্রয়োগ বিষয়ক গবেষণা করেন। তাঁর মতে প্রতিটি শিলাস্তরে কিছু বিশেষ জীবাশ্ম থাকে যা স্তরটিকে ঊর্ধ্বে ও অধস্তর থেকে পৃথক করতে সাহায্য করে।

কুভিয়ের জীবিত প্রাণীর অঙ্গসংস্থানের সঙ্গে অশ্মীভূত প্রাণীর তুলনামূলক বিচার করে তাদের পুনর্গঠন করেন যা থেকে প্রমাণিত হয় যে অতীতে এমন সব প্রাণীরা ছিল যারা অবলুপ্ত হলেও তাদের দেহগঠন বর্তমান প্রাণীদের মতোই ছিল। তাই গবেষণা থেকে বর্তমান প্রাণী ও উদ্ভিদের সঙ্গে অতীতের জীবকুলের তুলনা করার পথ প্রশস্ত হয়।

15.3.1 পুরাউদ্ভিদবিদ্যার ইতিহাস

1820 খ্রিস্টাব্দে স্টার্নবার্গ (Sternberg), সর্বপ্রথম পুরাউদ্ভিদবিদ্যা (Palaeobotany) সম্বন্ধে বই প্রকাশ করেন এবং এই বছরটিকে উদ্ভিদ জীবাশ্মের দ্বিপদ নামকরণের সূচনার তারিখ বলে গণ্য করা হয়। পরে ব্রনিয়ার্ট (Brongniart, 1828), তাঁর গ্রন্থে ভূতাত্ত্বিক কাল অনুযায়ী পুরাউদ্ভিদকে শ্রেণিবদ্ধ করেছেন। যেমন (1) ক্রিপ্টোগামের (Cryptogam) যুগ, (2) ফার্ণ ও কনিফারদের যুগ, (3) সাইকাডদের যুগ এবং (4) গুপ্তবীজীদের যুগ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদদেহের গঠনশৈলী যে সরল থেকে ক্রমশ জটিলতর হয়েছে তার স্পষ্ট প্রমাণ এখানে আমরা পাই। ক্রমে ক্রমে পুরাউদ্ভিদবিজ্ঞানীরা অশ্মীভূত উদ্ভিদের অন্তর্গঠন, বিবর্তন, পুরাভৌগোলিক পরিবেশ সম্বন্ধে কৌতূহলী হতে থাকেন। এই সব বিষয়ের ওপর কিছু গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। লেখকদের মধ্যে গোয়েপার্ট (Goeppert, 1836) সম লাউবাক (Solms-Laubach, 1887), জাইলার (Zeiller, 1900), পোটোনিয়ে (Potonie, 1921) প্রভৃতি অন্যতম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে আর্নল্ড (Arnold, 1947),

এনড্রিউজ (Andrews, 1947), ডেলিভোরিয়াস (Delevoryas, 1952), চ্যালোনার (Chaloner, 1958), স্টুয়ার্ট (Stewart, 1978), টেলর (Taylor, 1982) প্রমুখ পৃথিবী বিখ্যাত পুরাউদ্ভিদবিদগণের গবেষণালব্ধ ফল আধুনিক পুরাউদ্ভিদবিদার সূচনা করে এবং উদ্ভিদবিদ্যার এই শাখাটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি লাভ করে। ভারতবর্ষ কয়লাসহ অনান্য গণ্ডোয়ানা ভূস্তর সমৃদ্ধ হওয়ায় স্বভাবতই এর ওপর গবেষণার উৎসাহ তৈরি হয়। ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ (Geological Survey of India) এর প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এই বিভাগের ভূতাত্ত্বিক ওলধাম ও মরিস (Oldham & Morris, 1863), ফাইস্টম্যানটেল (Feistmantel, 1876) ভারতীয় নিম্ন গণ্ডোয়ানার (Lower Gondwana) উদ্ভিদকুল সম্পর্কে বহু প্রামাণ্য তথ্য প্রকাশ করেন যার মাধ্যমে ভারতীয় পুরাউদ্ভিদবিদ্যার সূত্রপাত হয়েছে বলে মনে করা হয়।

অবশ্য ভারতে পুরাউদ্ভিদবিদ্যার অগ্রগতি ও বিস্তারের সূচনা করেন অধ্যাপক বীরবল সাহনি (1918-1953)। তিনি লক্ষ্ণৌতে একটি পুরাউদ্ভিদবিদ্যা গবেষণাগারের (Birbal Sahni Institute of Palaeobotany) প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে আজও পুরাউদ্ভিদবিদ্যার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিয়মিত গবেষণা হয়। পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুরাউদ্ভিদবিদ্যার সূত্রপাত করেন অধ্যাপক অমিয় কুমার ঘোষ। রেণু জীবাশ্মের সাহায্যে সর্বপ্রথম তিনিই ভারতবর্ষে কয়লাস্তর বিন্যাসের চেষ্টা করেন (Ghosh & Sen, 1948)। এছাড়াও তিনি ও তাঁর সহযোগীরা ভারতের কেমব্রিয়ান স্তর (Cambrian) থেকে উদ্ভিদের সম্ভাব্য সংবাহী কলা যুক্ত দেহাংশ ও রেণু আবিষ্কার করেন (Ghosh & Bose. 1952)।

বর্তমানে বীরবল সাহানী পুরাউদ্ভিদবিদ্যা গবেষণাগার ও ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ (Geological Survey of India) ও. এন. জি. সি. (Oil and Natural Gas Commission) ওয়াদিয়া ইনস্টিটিউট অফ্ হিমালয়ান জিওলজি এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের (যেমন কলিকাতা, বিশ্বভারতী, বর্ধমান, কলাণী, এলাহাবাদ, নাগপুর, লক্ষ্ণৌ, যোধপুর, ওসমানিয়া, কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি) পুরাউদ্ভিদবিদ্যা গবেষণাগারে এই বিষয়ের ওপর নিয়মিত গবেষণা হয়। উপরিউক্ত গবেষণাগারগুলিতে বিভিন্ন সময়ে এম. এন. বোস, কে. আর. সুরঙ্গে, বিষ্ণু মিত্রে, দিব্যদর্শন পন্থ, সি. জি. কে. রামানুগম, বি. ডি. শর্মা প্রমুখ বিখ্যাত পুরাউদ্ভিদবিদগণ গবেষণা করেছেন এবং ভারতীয় পুরাউদ্ভিদবিদ্যাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

1954 খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক পুরাউদ্ভিদবিদ্যা সংস্থার (International organization of Palaeobotany) প্রতিষ্ঠা হয়। এই সংস্থা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুরাউদ্ভিদবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গবেষণালব্ধ ফল প্রকাশিত হয়।

15.4 জীবাশ্মবাহী শিলার প্রকৃতি

প্রান্তলিপি

শিলা (rock) ভূত্বকের প্রাথমিক উপাদান। এক বা একাধিক খনিজ পদার্থ (mineral) নিয়ে তৈরি হয় শিলা। শিলা তিন রকমের হয় (1) আগ্নেয় শিলা (igneous rock), (2) পাললিক শিলা (Sedimentary rock) ও (3) রূপান্তরিত শিলা (Meta morphic rock)।

পাললিক শিলাস্তর জীবাশ্ম সংরক্ষিত হওয়ার জন্য আদর্শ। সাধারণত মিহি কাদাপাথর বা বেলে পাথরে সংরক্ষণ নুড়ি পাথর যুক্ত শিলার থেকে ভালো হয় সমুদ্রজাত (marine) পাথরের স্তর মিষ্টজল জাত (freshwater) পাথরের তুলনায় সুবিন্যস্ত ও মিহি প্রকৃতির হয়। তাছাড়া সমুদ্রজাত স্তরে চুনের পরিমাণ

আগ্নেয় শিলা পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকা তরল শিলা বা ম্যাগমা (magma) আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ বা ভূমিজ ফাটল দিয়ে বেরিয়ে এসে জমাট বেঁধে তৈরি হয়। যেমন গ্রানাইট। নদীবাহিত পলি স্তরে স্তরে জমা হয়ে স্তরীভূত হয়ে পাললিক শিলা তৈরি করে। যেমন, বেলেপাথর (sandstone) চুনাপাথর (limestone)। আবার প্রচণ্ড তাপ চাপের ফলে আগ্নেয় ও পাললিক শিলা রূপান্তরিত হয়। যেমন নিস্ (gneiss), মার্বেল (marble) ইত্যাদি।

বেশি থাকে যা আসলে সমুদ্রজাত জীবের দেহাবশেষ থেকে আসে। বেলেপাথর (sandstone) ও শেল (shale) পাথর তৈরির উপাদান আসে উঁচু জায়গা বা উপত্যকার ক্ষয়জাত দ্রব্য হিসেবে নদীস্রোত দিয়ে জমা পড়ে নদীমুখে। অনেক সময় নদীমুখে ছোটো ছোটো বদ্বীপের সৃষ্টি হয়। পুরাজীবীর সময়ে (palaeozoic era) এই রকম সৃষ্টি বদ্বীপেই নিউইয়র্ক ও পেনসিলভানিয়া অঞ্চলে ছিল Archaeopteris বা Lepidodendron দের অরণ্য। অনেকসময় আগ্নেয়গিরির লাভাস্তর ক্ষয়ে গিয়ে যে স্তর সঞ্চিত হয় তার মধ্যে জীবাশ্মের সংরক্ষণ হয়। এভাবেই ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য (Deccan trap) ও রাজমহল (Rajmahal trap) ট্র্যাপের সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা হয়। উষ্ণপ্রস্রবণের জলে যে খনিজ থাকে তাতেও জীবাশ্ম সংরক্ষিত হয়, যেমন স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত রাইনিচার্ট স্তর (Rhynie chert)।

15.5 অশ্মীভবনের ধরন (modes of fossilization) ও জীবাশ্মের প্রকার (kinds of fossils)

ভিন্ন ভিন্ন অশ্মীভবনের ধরন অনুযায়ী জীবাশ্ম বিভিন্ন রকমের হয়। এগুলি উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহাংশ, তার ছাপ অথবা দৈহিক বিক্রিয়াজাত পদার্থও হতে পারে। উৎপত্তিগতভাবে জীবাশ্মকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়।

অশ্মীভবনের ধরন	জীবাশ্মের প্রকার	উদাহরণ
1. সিমেন্টেশনের (cementation) ফলে উদ্ভিদ/প্রাণীর উপরিতলের (surface preservation by cementation or authigenic preservation)।	(ক) মুদ্রিত বা ছাপ (impression) (খ) শাঙ্খবীয় বা অনুকৃতি জীবাশ্ম (cast)। (গ) মোল্ড (mould)।	ক্যালামিটিস (Calamites) কান্ডের ছাপ, স্টিগমারিয় (Stigmaria) মূলের অনুকৃতি।
2. জীবদেহের শক্ত অংশের সংরক্ষণ (hard part preservation or duripartic preservation)।		স্ট্রোমাটোলাইট জাতীয় চুনাপাথর (stromatolite) এবং ডায়াটম জাত মাটি (diatomite)।
3. অঙ্গারীভূত পিষ্ট অবস্থায় সংরক্ষণ (coalified compression)।		লিগনাইট (lignite), কয়লা (coal)।

অশ্মীভবনের ধরন	জীবাশ্মের প্রকার	উদাহরণ
4. জীবকোষের খনিজপৃক্ত সংরক্ষণ (Cellular permineralization)।	(ক) পেট্রিফেকসান (petrifaction)। (খ) সমীকরণ (mummification) (i) বরফের মধ্যে সংরক্ষণ। (ii) অ্যামবারের (amber) মধ্যে সংরক্ষণ।	রাইনিয়া (Rhynia), ড্যাডোজাইলন (Dadoxylon), কয়লা গোলক (coal ball)। ব্লিস্টোসিন উপযুগে জমাট বাঁধা অতিকায় হাতি (mammoth)। অশ্মীভূত রজনের (resin) মধ্যে আটকে থাকা কীটপতঙ্গ।

আকৃতিগত ভাবে জীবাশ্ম দুই ধরনের হয়। দৃশ্যমান (megafossil) জীবাশ্ম যেগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খালি চোখে বোঝা যায়। যেমন গ্লসপটেরিস (Glossopteris) পাতা। খালি চোখে দেখা যায় না এমন জীবাশ্মকে অণুজীবাশ্ম (microfossil) বলে। কেবলমাত্র অণুবীক্ষণযন্ত্রেই এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝা যায়। যেমন—পরাগরেণু রেণু, শৈবাল ইত্যাদি।

এছাড়াও জীবকোষের অভ্যন্তরস্থ রাসায়নিক যেমন প্রিসটেন (pristane) ফাইটেন (phytane), লিগ্‌নিস্, কিউটিন প্রভৃতি সংরক্ষিত হয়। এদের রাসায়নিক জীবাশ্ম (chemical fossil) বলে। অনেক সময় জৈব কার্বন মাটির নীচে তাপ ও চাপের ফলে পরিবর্তিত হয়ে অদ্রাব্য কেরোজেনে (kerogen) রূপান্তরিত হয় যা থেকে অবশেষে খনিজ তৈল পাওয়া যায়। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা (Golenberg, 1995) জীবাশ্ম থেকে অবিকৃত D.N.A. আবিষ্কার করেছেন।

কখনও কখনও জীবদেহের অংশ বিশেষ কারণে সম্পূর্ণভাবে শিলীভূত হয় না। এরকম অসম্পূর্ণভাবে অস্মীভূত দেহাংশকে উপজীবাশ্ম (subfossil) বলে। আবার প্রাণীর জৈবিক কর্মের চিহ্ন যেমন পায়ের ছাপ, চলাফেরার দাগ, সুড়ঙ্গ বা গর্ত। এরাও জীবাশ্মের আওতায় আসে। এদের ট্রেস ফসিল (trace fossil) বা ইক্‌নো ফসিল (ichno fossil) বলে। অনেকসময় পাথরের ফোকরে কোনো ছাপ উদ্ভিদ বা প্রাণী দেহের অংশ বলে ভ্রম হয়। এদের মেকি জীবাশ্ম (pseudo fossil) বলে।

1. সিমেন্টেশনের ফলে উদ্ভিদ/প্রাণীর উপরিতলের সংরক্ষণ :

(ক) **ছাপ (Impression) :** অশ্মীভবনকারী জীবদেহ বা দেহাংশ যদি চ্যাপটা ও দ্বিমাত্রিক (two dimensional) হয় (যেমন পাতা), অস্মীভূত হয়ে সেগুলি ছাপ (impression) জীবাশ্ম তৈরি করে। এতে যেহেতু জৈব কার্বন থাকে না এই জীবাশ্মে অন্তর্গঠন সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। কিন্তু জীবদেহাংশের উপরিতলের প্রকৃতি যেমন পাতার শিরা উপশিরার বিন্যাস পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়।

(খ) **ছাঁচ (mould) :** ত্রিমাত্রিক (three dimensional) জীব দেহাংশ (যেমন কাণ্ড বা বীজ) ভূস্তরে নিমজ্জিত হওয়ার পর তা অবলুপ্ত হলে ভূমিস্তরে এটি ও জীব দেহাংশের ত্রিমাত্রিক negative এর ক্ষত একটি ফাঁপা (hollow) স্থান সৃষ্টি করে একে ছাঁচ বলে। এই ছাঁচে জীব দেহাংশের বহির্ভাগের চরিত্রগুলি (যেমন কাণ্ডের উপরিভাগে পত্রমূল বা বীজ বা ফল ত্বকের কারুকার্য ইত্যাদি) শুধুমাত্র সংরক্ষিত হয়।

(গ) **শাঙ্খবীয় বা অনুকৃতি (cast) :** উপরিউক্তভাবে ছাঁচ তৈরি হওয়ার পর পরবর্তীকালে ওই ফাঁপা অংশটি

পলিস্তর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে আসল জীবদেহের মতো (positive replica) দেখতে জীবাশ্ম তৈরি করে থাকে। অনুকৃতি (cast) বলে স্বাভাবিকভাবেই এই জীবাশ্মতেও কোনো অন্তর্গঠন সংরক্ষিত হয় না।

2. **জীবদেহের শক্ত অংশের সংরক্ষণ :** কোনো কোনো সামুদ্রিক শৈবালের ও নীলাভ সবুজ শৈবালের চুন ক্ষরণকারী আবরণ থাকে। পরবর্তীকালে আবরণটি শক্ত হয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেহাকৃতি রক্ষা করে কিন্তু নরম অংশটি অবলুপ্ত হয়। স্ট্রোমাটোলাইটিস (stromatolites) জাতীয় চুনাপাথর বা ডায়াটম জাত মাটি (diatomite) এভাবেই সংরক্ষিত হয়। চুন অধঃক্ষেপণকারী শৈবালের (Ca-precipitating algae, যেমন Dasycladaceae, Coccolithophoraceae গোত্রভুক্ত শৈবাল) দেহাংশও এইভাবে সংরক্ষিত হয়।

3. **অঙ্গারীভূত পিষ্ট অবস্থায় সংরক্ষণ :** জীব দেহাংশ ভূমিস্তরে পৌঁছাবার পর তার ওপর ক্রমাগত পলিস্তর জমতে শুরু করে। ওপরের পলিস্তরের অত্যধিক চাপের ফলে দেহকোষের দেওয়ালগুলি চুপসে যায় ফলে জৈবকোষের জলীয়, গ্যাসীয় ও দ্রবণীয় অংশগুলি কমতে থাকে এবং ধীরে ধীরে অঙ্গারে পরিবর্তিত হতে থাকে। এই জীবাশ্ম থেকে আকৃতি, শিরাবিন্যাস, পত্রকিনারা ও বোঁটার উপস্থিতি/অনুপস্থিতি ইত্যাদি দেখা যায়। জৈব কার্বন থাকার ফলে এই জীবাশ্মের বিশ্লেষণ পদ্ধতি (maceration technique) সাহায্যে পাতার বহিস্তরের কোষের আকৃতি, সজ্জা, রোম ও পত্ররন্ধ্র ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। লিগনাইট (lignite) ও কয়লা (coal) পিষ্ট জীবাশ্মের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

4. **কোষের খনিজপৃক্ত সংরক্ষণ :** জীবকোষের মধ্যে খনিজ পদার্থ অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তৈরি হয় এই জীবাশ্ম। খনিজপৃক্ত জলে জীব দেহাংশ নিমজ্জিত হওয়ার পর বাইরে থেকে প্রবিষ্ট যৌগিক পদার্থের ওপর কোষ অভ্যন্তরস্থ কিছু বিজারকের (reducing agent যেমন হিউমিক অ্যাসিড, হাইড্রোজেন সালফাইড) সমন্বয়ের ফলে দ্রাব্য যৌগ (যেমন সিলিকেট) অদ্রাব্য যৌগে (সিলিকাতে) পরিণত হয়। এই অদ্রাব্য যৌগগুলি কোষপ্রাচীর ও অন্তঃকোষীয় গহ্বরে (intercellular space) জমা হয়ে একটি মজবুত গৌণ কাঠামো গঠন করে। কোষগুলি খনিজপৃক্ত হওয়ায় এরূপ জীবাশ্ম অন্তর্গঠন পর্যবেক্ষণ করার পক্ষে উৎকৃষ্ট।

খনিজপৃক্ত জীবাশ্ম দু'ধরনের। পেট্রিফেকশন (Petrifaction) ও সমীকরণ (mummificatioan)।

(ক) **পেট্রিফেকশন :** এই পদ্ধতিতে কোষ প্রাচীর ও আন্তঃকোষীয় গহ্বর খনিজ পৃক্ত হয়ে কোষের সুষ্ঠু সংরক্ষণের সাহায্য করে। খনিজটি সিলিকা হতে পারে। ক্রিপোকৃস্টালাইন (cryptocrystalline) ও এমরফাস (Amorphous) সিলিকা এখানে সংরক্ষণে সাহায্য করে। যেমন রাইনি চার্ট ও গানফ্লিন্ট চার্ট। কোষ যদি চুর্নক (calcified) সম্পৃক্ত হয় তখন কয়লা গোলক (coal ball) তৈরি হয়। অঙ্গার যুগের (Carboniferous) উদ্ভিদের অন্তর্গঠন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কয়লা গোলক থেকেই জানা গেছে। লৌহ পাইরাইট (pyrite) ফসফেট (phosphate) প্রভৃতিও জীবকোষে অনুপ্রবিষ্ট হতে পারে। তবে সাইরাইট অস্বচ্ছ হওয়ায় এরূপ জীবাশ্মের অন্তর্গঠন পর্যবেক্ষণ করতে অনেক সময় অসুবিধে হয়।

(খ) **সমীকরণ :** সমীকরণ পদ্ধতিতে সৃষ্ট জীবাশ্মও দু'ধরনের হতে পারে।

(i) বরফের মধ্যে সংরক্ষণ : এই ধরনের জীবাশ্মে, জীবদেহের তরল কলা দ্রুত ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে সূক্ষ্ম কেলাসিত বরফ কলা (microcrystalline ice) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। অত্যধিক ঠাণ্ডায় যেভাবে আমরা খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করি তার সঙ্গে এই পদ্ধতির তুলনা করা যেতে পারে। প্লিস্টোসিন উপযুগে জমাট বাঁধা অতিকায় ম্যামথ (mammoth) হাতি ম্যাসটোডন (mastodon) ও গণ্ডার এই ধরনের জীবাশ্মের আদর্শ উদাহরণ।

(iii) **রজনের মধ্যে সংরক্ষণ :** গাছের নিঃসৃত রজনের (resin) মধ্যে ছোটোখাটো কীটপতঙ্গ, রেণু, ফুল প্রভৃতি আটকে গিয়ে আস্তে আস্তে তার মধ্যে নিমজ্জিত হয় বেং বিশুষ্কীকরণের ফলে (dehydration) অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত হয়ে অ্যামবার (amber) পথে জীবাশ্ম গঠন করে। এই পদ্ধতিটি জলহীন (dehydrated) উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহাংশের কানাডা বালসামে (canada balsam) আবৃত করে সংরক্ষণ করার সঙ্গে তুলনীয়।

15.6 জীবাশ্মীকরণ পদ্ধতি ও সংরক্ষণের শর্তসমূহ

জীবদেহ অশ্মীভূত হয় ভৌতিক (physical) ও জৈব রাসায়নিক (organo chemical) এই দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। জৈব পদার্থের দ্রুত পরিবহন (transportation) ও নিমজ্জন (immersion) এবং জলাশয়ের (basin) প্রকৃতি, গঠন, জলের গভীরতা প্রভৃতি হল উল্লেখযোগ্য ভৌতিক (physical) প্রক্রিয়ার অন্যতম। জীব-দেহাংশের দ্রুত পরিবহন জলস্রোতের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে। দেহকোষের সংরক্ষণ নির্ভর করে। জলাশয়ের জলের প্রকৃতির ওপর। জল নিস্তরঙ্গ হলে (যেমন উপহ্রদ ও হ্রদে) দেহাংশ সহজে ডুবে যায় এবং সংরক্ষণ ত্বরান্বিত করে অগভীর জল বা তরঙ্গসংকুল অবস্থা সংরক্ষণের পরিপন্থী। সুপেয় জলের (fresh water) তুলনায় লবণাক্ত জলে জীবদেহে ছত্রাকের সংক্রমণ কম হয় ফলে লবণাক্ত জলে জীবদেহের সংরক্ষণ ভাল হয়, অনেক সময় জলে অক্সিজেনের স্বল্পতাও ছত্রাকের বৃদ্ধি রোধ করে।

পলিস্তরের গভীরতা ও পলির প্রকৃতির ওপর সংরক্ষণ নির্ভরশীল। মিহি পলি নুড়িপাথর মিশ্রিত পলি অপেক্ষা ভালো। নুড়িপাথর মিশ্রিত পলিতে ঘর্ষণের ফলে জীবদেহাংশের ক্ষতি হয়।

উপরিউক্ত ভৌতিক প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে সঙ্গে চলে বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক প্রক্রিয়া। জলে দ্রবীভূত সিলিকেট, ফসফেট, কার্বনেট প্রভৃতি যৌগ দেহকোষে প্রবিষ্ট হয়ে অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং মজবুত কাঠামো তৈরি করে যা ওপরের স্তরের ক্রমবর্ধমান চাপ থেকে কোষগুলিকে রক্ষা করে। কখনও কখনও কোষের সেলুলোজ ও লিগামিন অঙ্গারীভূত হয়। বহিস্তকে কিউটিকল ও রেণুর বহিঃস্তর (exine) অবিকৃত থাকে। রেণু প্রাচীরে স্পোরোপোলেলিন (sporopollenin) নামক এক যৌগ থাকে যা রেণুর আকৃতি ও প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করে। পলিস্তরের সাথে জীব দেহাংশ বহুদূর পর্যন্ত পরিবাহিত হলে সেগুলি ভেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ফলে ত্রুটিযুক্ত জীবাশ্ম তৈরি হয়। আদর্শ জীবাশ্ম সংরক্ষণের জন্য জীব দেহাংশের স্বল্প দূরত্ব পরিবহন বা কোনোরকম পরিবহন না হলে (in situ) ভালো হয়।

অনেক সময় জীবাশ্ম সুসংরক্ষিত হওয়ার পর পৃথিবীর অভ্যন্তরের ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী যেমন গিরিজনিত কার্যাবলী (organic activities) ইত্যাদির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

15.7 জীবাশ্মের নামকরণ

জীবদেহের বৈচিত্র্যের মতো এদের নামেরও বৈচিত্র্য আছে। প্রজাতির দ্বিপদ নামকরণ লিনিয়ুস (Linnaeus, 1753) তাঁর প্রজাতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। জীবাশ্মের ক্ষেত্রে দ্বিপদ নামের শুরু স্টার্নবার্গের গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার তারিখ 1820 সাল থেকে। জীবন্ত ও জীবাশ্মের প্রয়োগ ভিন্ন হলেও নামকরণের আন্তর্জাতিক বিধি একই রকমের।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জীবাশ্ম পাওয়া যায় বিচ্ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হিসেবে। খুব কম ক্ষেত্রেই জীবের সম্পূর্ণ জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। বিচ্ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে দুই রকম গণ ব্যবহার অনুমোদিত হয়েছে। একটি অরগ্যান গণ বা অঙ্গাজগণ (organ genus) যা ব্যবহৃত হয় একটি বা একাধিক সম্বন্ধযুক্ত অত্যঙ্গের ক্ষেত্রে এবং যেগুলিকে নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলির ওপর নির্ভর করে একটি নির্দিষ্ট গোত্রভুক্ত করা যায়। যেমন টিলোফাইলাম (*Ptilophyllum*) উইলিয়ামসোনিয়া (*Williamsonia*) প্রভৃতি অঙ্গাজগণ যাদের উইলিয়ামসোনিয়েসী (*Williamsoniaceae*) গোত্রভুক্ত করা যায়।

অন্যটি ফর্মগণ (form genus) যা ব্যবহৃত হয় সেই সব প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে যাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অজ্ঞাত, ফলে এদের নির্দিষ্ট কোনও গোত্রভুক্ত করা সম্ভব হয় না। এরূপ গণ কৃত্রিম, কিন্তু স্বরূপ প্রমাণিত হলে এদের অন্য স্বাভাবিক গণে স্থানান্তরিত করা যায়। যেমন সাইপেরাইটিস (*Cyperites*) গণ, এই গণটি লেপিডোডেন্ড্রেলিস বর্গীভূত গোত্রের লেপিডোডেন্ড্রেসি (Lepidodendraceae), সিজিলরিয়েসি (Sigillariacae) ও বোথ্রোডেন্ড্রেসি (Bothrodendraceae) যে কোনও গণের পাতার চরিত্র বহন করে। সুতরাং এই গণটিকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে নির্দিষ্ট কোনও গোত্রভুক্ত করা যায় না।

ফর্ম ও অরগ্যান গণের নাম ও আদর্শ (type) ভিত্তিক হতে হবে। সুতরাং বিবরণের সময় আদর্শ সংগ্রহের সুনির্দিষ্ট উল্লেখ প্রয়োজন। নামকরণের সময় যাতে প্রত্যঙ্গটির প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যায় সে বিষয়ে নজর রাখা দরকার। যেমন নামের শেষে -ফাইলাম (-phyllum) থাকলে পাতা, -কার্পাস (-carpus), কার্পন থাকলে বীজ বা ফল, -ওজাইলন (oxylon) থাকলে গৌণ কাষ্ঠল অংশ নির্দেশ করবে। কোনও একটি জীবের প্রায় সব কয়টি অঙ্গাজগণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হওয়ার পর সম্পূর্ণ উদ্ভিদ বা প্রাণীটি দেখতে কেমন ছিল সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা তৈরি হয়। পুনর্গঠনের (reconstruction) এই ধাপ পর্যন্ত, পৌঁছাবার পর পুরাজীববিদ প্রাচীনত্বের বিধি এ (rule of priority) সর্বাধিক প্রাচীন (সালের পর) বৈধ প্রকাশিত যে কোনও অঙ্গাজগণের নামে সম্পূর্ণ জীবটির গণের নামকরণ করতে পারেন। এই পরিস্থিতিতে অঙ্গাজ গণটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক গণের (natural genus) সমতুল্য।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে নামকরণের বিধি জীবন্ত ও অশ্মীভূত অংশের একই প্রকারের। নিম্ন ও উচ্চ সকল পদকেই ট্যাকসন (taxon) নামে অভিহিত করা যায়। সকল নামই লাতিন ভাষায় গঠিত হবে বা নামটিকে লাতিনের মতো করে নিতে হবে। প্রতিটি প্রজাতি পর্যায়ক্রমে অনেকগুলি পদের অন্তর্গত।

যেমন প্রজাতি → গণ → গোত্র → পর্ব → শ্রেণি → বিভাগ। এই পদ পর্যায়ক্রমের পরিবর্তন বৈধ নয়।

যে কোনো বৈধ নামের জন্য

(1) আদর্শভিত্তিক (type) হওয়া,

(2) স্বীকৃত ভাবে প্রকাশিত হওয়া, একাধিক নাম থাকলে,

(3) সর্বপ্রাচীন নামটি গ্রহণ করা ও নামটি

(4) লাতিন ভাষায় গঠিত হওয়া প্রয়োজন।

জীবের প্রজাতি, গণ ও পর্বের যিনি উদ্‌ভাবক তাঁর নামই জীবটির নামের শেষে উল্লেখিত হবে। অনেক সময় পথের উদ্‌ভাবক নামটির পাশে তাঁর নাম মুদ্রিত নাও করে থাকতে পারেন এক্ষেত্রে তাঁর নামের শেষে 'ex' যুক্ত করে যিনি পরবর্তী কালে নামটি মুদ্রিত করছেন তার নামটির উল্লেখ করতে হবে। কেউ যদি নামকরণে কোনও সংশোধন করেন তাহলে উদ্‌ভাবকের নামের পরে 'emend' কথাটির ও তারপর সংশোধকের নাম বসাতে হবে।

15.8 জীবাশ্ম থেকে জীবদেহের পুনর্গঠন (Reconstruction)

জীবাশ্মবিদরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জীবদেহের সম্পূর্ণ দেহাবশেষের জীবাশ্ম পান না। সাধারণত উদ্ভিদ বা প্রাণীদেহের বিভিন্ন অংশ আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে পাওয়া যায়। উদ্ভিদদের ক্ষেত্রে মূল, কাণ্ড, পাতা, বীজসহ অন্যান্য উর্বর অংশ এবং প্রাণীর ক্ষেত্রে শিলীভূত হাড়—হাত, পা, শ্রেণিচক্র, পাঁজর, কশেরুকার অংশ, করোটি, দাঁত, কিম বা সলাশ্ম (Caprolite) বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম এই খণ্ডাংশগুলির বিশদ চরিত্র বিশ্লেষণ করেন যার ওপর নির্ভর করে আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে একটি সম্পূর্ণ উদ্ভিদ বা প্রাণীদেহের অবয়ব। অবশ্য তার আগে এই প্রজাতির অন্যান্য নমুনা এবং কনিষ্ঠ সম্পর্কের অন্য প্রজাতির পর্যালোচনা প্রয়োজন।

জীবদেহের খণ্ডাংশগুলির পুনর্ণির্মাণের সময় যেসব প্রামাণ্য তথ্যের (evidence) সাহায্য নেওয়া হয় তাদের মোটামুটি দু'ভাবে ভাগ করা যায় (i) প্রত্যক্ষ প্রমাণ। (ii) পরোক্ষ প্রমাণ।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ : অশ্মীভূতজীবের খণ্ডাংশগুলির মধ্যে জৈব সংযোগ (organic connection) থাকলে সেগুলি যে একই উদ্ভিদ বা প্রাণীদেহের তা প্রমাণ করা সহজ হয়। পুনর্নির্মাণে এই ধরণের প্রত্যক্ষ প্রমাণকে সবথেকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করা হয়। আর্কেওপটেরিস (*Archaeopteris*) উদ্ভিদের পুনর্নির্মাণের আগে (*Archaeopteris*) বলতে একটি বিচ্যুত (dispersed) টেরিডোকাইটের শাখা ও ক্যালিজাইলন (*Callixylon*) কে একটি জিম্নোস্পার্মের কাণ্ড বলে মনে করা হত। চার্লস বেক (Charles Beck, 1960) সর্বপ্রথম এই দুটি অংশের মধ্যে জৈব সংযোগ প্রমাণ করেন যা থেকে প্রোজিমপোস্পার্ম (Progymposperm) ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরোক্ষ প্রমাণ : পরোক্ষ প্রমাণগুলির মধ্যে

(ক) সঙ্গী জীবাশ্মসমূহ

(খ) গঠনগত মিল

(গ) পরাগ সংযোগগত কিছু চরিত্র যা থেকে প্রমাণ করা যায় জীবাশ্মগুলি একই উদ্ভিদভুক্ত ইত্যাদি অন্যতম।

অনেক সময় কোনও জীবাশ্মের পুনর্নির্মাণে তার সঙ্গী জীবাশ্মগুলির উপস্থিতি ও সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। যেমন মেডুলোসা নোয়ি (*Medullosa noei*) কাণ্ডের জীবাশ্মের সাথে প্রচুর পরিমাণে অ্যালিথপ্টেরিস্ (*Alethopteris*) পাতা, প্যাচিটেষ্টা (*Pachytesta*) বীজ ইত্যাদি পাওয়া যায়। যদিও এগুলির মধ্যে কোনও জৈব সংযোগ পাওয়া যায়নি কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় এই উদ্ভিদঅংশগুলির নিয়মিত উপস্থিতি এগুলি যে একই উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ তা প্রমাণ করে। অবশ্য এ ধরনের পরোক্ষ প্রমাণ ভিত্তিক পুনর্নির্মাণ সংশয়ের ঊর্ধ্বে নয়।

আবার অঙ্গসংস্থানগত ভাবে ভিন্ন উদ্ভিদ অংশের অন্তর্গঠনগত মিলের ওপর ভিত্তি করে তাদের মধ্যে জৈব সংযোগ প্রমাণ করা যায়। Oliver ও Scott (1904) কার্বনিফেরাস যুগের *Lagenostoma lomaxi* বীজের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে ক্যাপিটেট গ্রন্থির (capitate gland) উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে তাঁরা (*Lyginopteris oldhamia*) উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতার মধ্যে একই ধরনের গ্রন্থির উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। যার ওপর ভিত্তি করে অবশেষে এই উদ্ভিদ অংশগুলির জৈবিক সংযোগ প্রমাণিত হয়। ডিম্বকের রেণুরন্ধ্রের মধ্যে পাওয়া রেণুর উপস্থিতি ওই রেণুবাহী অংশটির সাথে ডিম্বকবাহী অংশটির জৈব সংযোগ প্রমাণ করে। অনেক সময় জীবাশ্ম জীব দেহ খণ্ডাংশগুলির মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট একটি অংশের অনুপস্থিতি পুনর্নির্মাণে সাহায্য করে।

15.9 জীবাশ্ম পরীক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি

উত্তমরূপে সংরক্ষিত যে কোনও জীবাশ্মের বহির্গঠন ছাড়াও অন্তর্গঠনের পর্যবেক্ষণও সম্ভব। তার আগে বিভিন্ন যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পদ্ধতির মাধ্যমে অশ্মীভূত দেহাংশগুলিকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষার উপযোগী করে তোলা হয়।

খনিজপৃক্ত (petrified) কাণ্ডের বা অন্য উদ্ভিদ অংশের প্রস্থচ্ছেদ ও লম্বছেদের জন্য ব্যবহৃত পাথর কাটা যন্ত্রের সাহায্যে পাতলা অংশ কেটে নিয়ে ঘষে ঘষে ক্ষীণ করে তা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করা হয় (thin section method)। শিলার প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের অম্ল (acid) ও ক্ষার (alkali) ব্যবহার করে শিলাকে গলিয়ে তা থেকে উদ্ভিদ অণুজীবাশ্ম (plant microfossil, যেমন, রেণু, কিউটিকল, ট্রাকিড প্রভৃতি) পৃথক করা হয় (maceration method)। এভাবে লিগ্‌নাইট ও কয়লার মধ্যে আবদ্ধ অণুজীবাশ্মকে সাধারণত পৃথক করা হয়। অপেক্ষাকৃত নবীন পিট্ (peat) বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির একটু অদলবদল করা হয়। এক্ষেত্রে এসিটোলিসিস acetolysis; acetic anhydride ও cone.H_2So_4, 9 : 1 অনুপাতে) পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। এছাড়াও লিগ্‌নাইট ও কয়লার টুকরো ভালোভাবে মসৃণ করে তা পাথরের অন্তর্গঠন পরীক্ষার উপযোগী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের (petrographic microscope) পতিত আলোর (reflected light) সাহায্যে পরীক্ষা করে কয়লা ইতাদির মধ্যে প্রোথিত উদ্ভিদ অণুজীবাশ্মগুলির আকৃতি প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যায়।

কর্তন পদ্ধতি (Thin section method) : প্রথমে খনিজপৃক্ত জীবাশ্মের পছন্দমতো অংশ পাথরকাটা যন্ত্রের সাহায্যে কাটা হয়। এরপর কর্তিত তল দুটি যন্ত্র পরিচালিত লোহার চাদরের ওপর (section grinding macline) কার্বরান্ডাম চূর্ণ (carborndum powder) ও জলের সাহায্যে মসৃণ করা হয়। কিছুটা মসৃণ হওয়ার পর টুকরোটিকে অ্যারালডাইট (*araldite*) ও হার্ডেনার (*hardener*) নামক দুটি রাসায়নিক মিশ্রণ দিয়ে একটি কাচখণ্ডে আটকে দেওয়া হয়। ভালোভাবে আটকে যাওয়ার পর জীবাশ্মখণ্ডটিকে পুনরায় কার্বরান্ডাম চূর্ণ দিয়ে কাচের চাদরের ওপর মসৃণ করা হয় যতক্ষণ না কোষসহ অন্যান্য অন্তর্গঠন স্পষ্ট হয়। অবশেষে এটিকে কানাডা বালসাম (canada balsam) দিয়ে ক্ষীণ কাচখণ্ড (cover slip) দিয়ে আবৃত করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করা হয়।

যান্ত্রিক কর্তন পদ্ধতিতে অনেকটা জীবাশ্ম নষ্ট হয় তাই বর্তমানে রাসায়নিক কর্তন পদ্ধতি বা পিল পদ্ধতির (Peel method) সাহায্য নেওয়া হয় যেখানে একটি জীবাশ্মখণ্ড থেকে অনেকগুলি ক্ষীণ কর্তিত অংশ পাওয়া যায়।

রাসায়নিক কর্তন বা পিল পদ্ধতি (Peel method) : এই পদ্ধতিতে জীবাশ্মের টুকরোটি কেটে উপরিউক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী মসৃণ করা হয়। এরপর মসৃণ অংশটির ওপর শিলার প্রকৃতি অনুযায়ী অ্যাসিডের পাতলা আস্তরণ দেওয়া হয়। (কার্বনেট যুক্ত পাথর হলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং সিলিকাযুক্ত হলে হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়)। মসৃণতলটি অমসৃণ হলে অ্যাসিড ভালো করে ধুয়ে নিতে হয় এবং তারপর পিল দ্রবণের পাতলা আস্তর দেওয়া হয়। ভালোভাবে শুকিয়ে যাওয়ার পর পিল স্তরটি আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে তারপর সেটিকে কানাডা বালসাম দিয়ে ক্ষীণ কাচখণ্ড দিয়ে আবৃত করা হয়।

বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Maceration method) : কয়লা বা এজাতীয় শিলাকে চূর্ণ করে তার মধ্যে সিলিকা থাকলে তা দূর করার জন্য সর্বপ্রথম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দেওয়া হয়। পাতিত জল দিয়ে বারবার ধুয়ে নিয়ে

তারপর এতে ঘন নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) ও পটাশিয়াম ক্লোরেট (এর বদলে সোডিয়াম ক্লোরেটও ব্যবহার করা চলে) দিয়ে জারিত করা হয়। জারণ বিক্রিয়া সম্পন্ন হলে ভাল করে পরিশ্রুত জল দিয়ে ধুয়ে নিতে হয়। এরপর জারিত অ্যাসিড যুক্ত অংশে 10 ভাগ কস্টিক পটাশের (10% KOH) দ্রবণ দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট ছাকনিতে দ্রবণটি ছেঁকে নিয়ে পরিস্রুত জল দিয়ে সেন্ট্রিফিউজ মেশিনে ক্রমাগত ধুয়ে নিতে হয়। ক্ষার যুক্ত হলে গ্লিসারিন দ্রবণে (50%) এটিকে সংরক্ষণ করা হয়।

15.10 জীবাশ্মের গুরুত্ব

জীবাশ্ম তার সৌন্দর্য ও চেহারার বৈচিত্র্যে প্রাগৈতিহাসিক মানুষকেও আকৃষ্ট করেছিল। আদি প্রস্তরযুগের মানুষ প্রিয়জনের সমাধিতে সুন্দর সুন্দর সামুদ্রিক জীবাশ্ম সাজিয়ে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাত। মধ্যযুগের নানা প্রবাদে ও জনশ্রুতিতে জীবাশ্মের দৈবশক্তি ও দ্রব্যগুণের কথা শোনা যায়। আর শালগ্রাম শিলার কথা কে না জানে? এরা অ্যামোনাইট (Ammonite) নামে এক ধরনের সামুদ্রিক প্রাণীর জীবাশ্ম। মিশরের মরুপ্রদেশে এদের দেবরাজ জুপিটার হিসেবে ও আমদের দেশে নারায়ণ হিসেবে পুজা করা হয়। অশ্মীভূত রজন বা অ্যামবারের (amber) মধ্যে হৃদযন্ত্র, মস্তিষ্কের অনেক রোগ নিরাময়ের দ্রব্যগুণ আছে বলে মনে করা হয়। রেড ইন্ডিয়ানরা আরিজোনার জীবাশ্ম পার্কের পাথর হয়ে যাওয়া বিশাল গাচের গুঁড়িগুলিকে দৈত্যদানোর হাত বলে ভাবত, এত গেল জীবাশ্ম সম্পর্কে মানুষের অদ্ভুত সব ধারণা, বিশ্বাস, দ্রব্যগুণ ইতাদি।

বর্তমানে জীবাশ্মবিদ্যা, বিশেষ করে পুরাউদ্ভিদবিদ্যা বা উদ্ভিদজীবাশ্মবিদ্যার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। শ্রেণিবিন্যাস (Taxomony), বাস্তুবিদ্যা (Ecology), জৈব রসায়ন (Biochemistry), উদ্ভিদ রোগবিদ্যা (Plant Pathology) প্রভৃতি উদ্ভিদবিদ্যার বিভিন্ন শাখা ভূবিদ্যা (Geology), ভূগোল (Geography) পুরাতত্ত্ববিদ্যা (Archaeology) প্রভৃতি অন্যান্য শাখার সঙ্গে উদ্ভিদ জীবাশ্মবিদ্যার সরাসরি সংযোগ প্রমাণিত হয়েছে। এই শাখাটির গুরুত্ব নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

1. জীবের উৎপত্তির আলোচনায় দেখা গেছে যে পৃথিবীতেই ভৌত ও রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জৈব যৌগ তৈরি হয়েছিল যা থেকে জীবের উৎপত্তি ঘটেছে। জীবাশ্ম থেকেই জানা যায় এই প্রাণের সৃষ্টির রহস্য প্রাথমিক জীব কেমন ছিল, কেমন করে অক্সিজেন (O_2) ও ওজোন তৈরি হল, প্রোক্যারিউট (Prokryote) থেকে ইউক্যারিওটের (Eukaryote) উৎপত্তি হল ইত্যাদি।
2. উদ্ভিদ জীবাশ্ম থেকে ভূতত্ত্বীয় সময়কালে বিভিন্ন উদ্ভিদগোষ্ঠীর উদ্‌বর্তন ও বিবর্তন সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।
3. উদ্ভিদ জীবাশ্ম থেকে অতীতে বিভিন্ন উদ্ভিদের উৎপত্তি ও বিলুপ্তির একটি সম্ভাব্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। নতুন প্রজাতির উদ্ভবের চেয়ে প্রজাতি বিলোপের হার যে অনেক বেশি তা প্রমাণিত হয়েছে।
4. উদ্ভিদ জীবাশ্ম থেকেই আমরা জানতে পারি কিভাবে অতীতে হালকা উদ্ভিদ ক্রমে ক্রমে স্থলে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং স্থলে অভিযোজিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন চরিত্র যেমন সংবাহী কলার উপস্থিতি, কিউটিন ও লিগ্‌নিনের উপস্থিতি, গ্যাসীয় আদান প্রদানের জন পত্ররন্ধ্র প্রভৃতি স্থলজ উদ্ভিদে তৈরি হয়েছিল, সে সম্পর্কেও একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।
5. কোন নতুন উদ্ভিদ জীবাশ্মের আবিষ্কার অনেক সময় প্রচলিত ধারণা বদলে দেয়। যেমন চার্লস বেক

(Charles Beck, 1960) *Archaeopteris* উদ্ভিদ জীবাশ্ম আবিষ্কার করার পর প্রোজিম্নোস্পার্ম (Progymnosperm) নামে এক নতুন উদ্ভিদগোষ্ঠী সম্পর্কে ধারণার সূচনা হয়।

6. মহাদেশীয় বিচ্যুতি (Continental Drift) তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার সময় জার্মান বিজ্ঞানী ওয়েগনার (Wegner, 1910) উদ্ভিদ জীবাশ্মকে অন্যতম প্রামাণ্য তথ্য হিসেবে ব্যবহার করেন। ওয়েগনার মনে করেন গণ্ডোয়ানা (Gondwana) প্রকৃতই একটি অতি মহাদেশ (Super continent) ছিল। পরে এটির বিভিন্ন মহাদেশগুলি (যেমন, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ভারতবর্ষ, অ্যান্টার্কটিকা ইত্যাদি) ভাগ হয়ে একে অন্যের থেকে দূরে সরে গেছে। বর্তমানে এই মহাদেশগুলির পার্মিয়ান (Permian) যুগের ভূস্তর থেকে গ্লাসপ্টেরিস (Glossopteris flora) উদ্ভিদরাজির উপস্থিতি প্রমাণ করে সে সেই সময়ে মহাদেশগুলি একত্রিত অবস্থায় ছিল।
7. উদ্ভিদ জীবাশ্ম ভূতাত্ত্বিক সময়ের উদ্ভিদের বিস্তার ও পরিবেশ সম্বন্ধে অবহিত করে এবং প্রত্নভৌগোলিক (Palaeogeography) অবস্থা পুনর্গঠনে বিশেষ সহায়তা করে।
8. ভূস্তরের প্রাচীনতা নির্ধারণে বিশেষ সাহায্য করে। এক্ষেত্রে কিছু সূচক জীবাশ্মের (index fossil) সাহায্য নেওয়া হয়। যেমন *Dicroidium* উদ্ভিদ জীবাশ্মের উপস্থিতি সাধারণত ট্রায়াসিক (Triassic) যুগ চিহ্নিত করে।
9. উদ্ভিদ জীবাশ্ম, বিশেষত উদ্ভিদ অণু জীবাশ্ম (microfossil) প্রাচীন সমুদ্রতট (palaeo shore line) নির্ধারণে সাহায্য করে। অনেক সময় গিরিজনি (Orogeny), হিমপর্যায় (glacial) বা হিমবিরতির (interglcial) সময় সমুদ্রের উপরিতলের (sea-level) পরিবর্তন ঘটে যা অনুজীবাশ্মের সাহায্যে নির্ধারণ করা যায়।
10. উদ্ভিদ জীবাশ্ম ভূস্তর বিন্যাসে অপরিহার্য; আন্তর্জাতিক কালস্তরীয় একক (Chronostratigraphic unit) ও আঞ্চলিক জীবস্তরীয় একক (Biostratigrphic unit) গঠনে সাহায্য করে। দুই বা ততোধিক বিচ্ছিন্ন স্তরের পারম্পর্য নির্ণয়ে সাহায্য করে এবং স্বাভাবিকভাবেই খনিজ সম্পদ (কয়লা, পেট্রোলিয়াম) প্রভৃতি অনুসন্ধানে সাহায্য করে।
11. প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের বিভিন্ন উদ্ভিদের ব্যবহার সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। গুহাবাসী মানুষ ক্রমে ক্রমে কীভাবে চাষ আবাদ শুরু করল সেই বিষয়ে অনেক কিছু আমরা উদ্ভিদ জীবাশ্ম থেকে জানতে পারি। প্রত্নউদ্ভিদবিদ্যার এক গবেষণা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে অতীতে মানুষ রিঠার (*Sapindus*) শ্যাম্পু হিসেবে ব্যবহার জানত।
12. অনেক সময় পুরারেণুবিদ্যা (palacopalynology) অপরাধীকে ধরতে সাহায্য করে। Erdtman (1969) এই বিষয়ের সাহায্য নিয়ে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে একটি যুগের কেসের সমাধান করেছিলেন।
13. অনেক সময় উদ্ভিদ জীবাশ্মে নিউক্লিক অ্যাসিড প্রায় অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত হয়। Golenberg (1990) সর্বপ্রথম টার্সিয়ারি যুগের ম্যাগনোলিয়া (Magnolia) পাতার অঙ্গারীভূত পিষ্ট জীবাশ্ম (coalified compression) থেকে ক্লোরোপ্লাসটিড জিন rbc পৃথক করেন। এই আবিষ্কার প্রমাণ করে যে নিউক্লিক অ্যাসিডও সংরক্ষিত হতে পারে এবং একটি নতুন শাখা পুরাজিনবিদ্যার (Palaeogenetics) সূচনা হয়।

15.11 সারাংশ

ভূতাত্ত্বিক যুগের প্রাণের চিহ্নকে জীবাশ্ম বলে। প্রাচীন পৃথিবীর হারিয়ে যাওয়া জীবনের অনুসন্ধানে প্রধান সহায় হল জীবাশ্ম। ভূস্তরের বিভিন্ন শিলাস্তরের মধ্যে পাললিক শিলাস্তর জীবাশ্ম সংরক্ষিত হওয়ার পক্ষে আদর্শ ভৌত ও জৈব রাসায়নিক— এই দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাধারণত জীব দেহাংশ অস্মীভূত হয়। ভৌত পক্রিয়ার মধ্যে জৈব পদার্থে দ্রুত পরিবহন, নিমজ্জন, জলের গভীরতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রাসায়নিক শর্তগুলির অন্যতম প্রধান হল জলে দ্রবীভূত সিলিকেট, ফসফেট কার্বনেট প্রভৃতির উপস্থিতি যা দেহকোষে প্রবিষ্ট হয়ে অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং জীবাশ্মের মজবুত কাঠামো তৈরি করে।

অশ্মীভবনের ধরন অনুযায়ী চার রকমের সংরক্ষণ হতে পারে, যেমন (ক) সিমেন্টেশনের ফলে জীবদেহের উপরিতলের সংরক্ষণ (ছাপ, অনুকৃতি ও মোল্ড), (খ) জীবদেহের শক্ত অংশের সংরক্ষণ (গ) অঙ্গারীভূত পিষ্ট অবস্থায় সংরক্ষণ ও (ঘ) জীবকোষের খনিজপৃক্ত সংরক্ষণ (পেট্রিফেকশন ও সমীকরণ)। আকৃতিগতভাবে জীবাশ্ম দৃশ্যমান ও অতিক্ষুদ্র অনুজীবাশ্ম হয়। জীবকোষের অভ্যন্তরস্থ রাসায়নিক সংরক্ষিত হয়ে রাসায়নিক জীবাশ্ম তৈরি করে। আবার প্রাণীর জৈবিক কর্মের চিহ্ন (চলাফেরার চিহ্ন) সংরক্ষিত হলে সেগুলিও জীবাশ্মের আওতায় আসে, এদের ট্রেস ফসিল বলে।

জীবাশ্ম ও জীবন্ত জীবদেহের নামকরণের আন্তর্জাতিক বিধি একই রকমের। জীবাশ্মের ক্ষেত্রে দ্বিপদ নামকরণের শুরু 1820 সাল থেকে। যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জীবাশ্ম পাওয়া যায় তাই জীবাশ্মের নামকরণে দুইরকম গণের ব্যবহার সিদ্ধ। নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ গুলিকে কোনও নির্দিষ্ট গোত্রভুক্ত করা গেলে তাদের অঙ্গাজগন এবং নির্দিষ্ট কোনও গোত্রভুক্ত না করা গেলে বলে ফর্মগণ। একটি জীবের সব কয়টি অঙ্গ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হলে পুরাজীববিদ জীবটির সম্ভাব্য সম্পূর্ণ অবয়ব পুনর্গঠন করেন। জীবাশ্মবিদ্যার সঙ্গে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সরাসরি যোগ রয়েছে বলে মনে করা হয়। পৃথিবীতে প্রাণের উন্মেষ থেকে শুরু করে জীবের উদ্‌বর্তন, বিবর্তন, বিভিন্ন সময়ে তাদের উৎপত্তি, বিলুপ্তির পরিসংখ্যান আমরা জীবাশ্ম অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানতে পারি। এছাড়া ভূতাত্ত্বিক সময়ের পরিবেশ, প্রত্নভৌগোলিক অবস্থার পুনর্গঠন, ভূস্তরের প্রাচীনতা ও পারস্পর্য নির্ধারণ, খনিজ সম্পদ তথা জীবাশ্ম জ্বালানির অনুসন্ধানে জীবাশ্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

15.13 প্রান্তীয় প্রশ্নাবলি ও উত্তরমালা

1. সঠিক উত্তরটিতে (✓) টিক চিহ্ন দিন
   (a) যে বছরটিকে উদ্ভিদ জীবাশ্মের দ্বিপদ নামকরণের সূচনার তারিখ বলে গণ্য করা হয় তা হল (i) 1753, (ii) 1720, (iii) 1820, (iv) 1920
   (b) জীবাশ্ম সংরক্ষিত হওয়ার জন্য সবচেয়ে আদর্শ শিলাস্তর হল (i) পাললিক (ii) আগ্নেয় (iii) রপান্তরিত (iv) কোনওটি নয়।
   (c) ভারতে পুরাউদ্ভিদবিদ্যার অগ্রগতি ও বিস্তারের সূচনা করেন (i) বীরবল সাহানি (ii) ফাইস্টম্যানটেল (iii) অমিয় কুমার ঘোষ (iv) শফ।

(d) জীবাশ্মের অন্তর্গঠন পর্যবেক্ষণ করার পক্ষে উৎকৃষ্ট সংরক্ষণ হল (i) অঙ্গারীভূত পিষ্ট অবস্থায় সংরক্ষণ (ii) অনুকৃতি (iii) কোষের খনিজপৃক্ত সংরক্ষণ (iv) ছাঁচ

(e) উদ্ভিদ জীবাশ্মের নামের শেষে –oxylon থাকলে তা উদ্ভিদটির যে অংশ নির্দেশ করবে তা হল (i) পাতা (ii) বীজ (iii) মূল (iv) গৌণ কাষ্ঠল অংশ।

2. (a) অশ্মীভবনের ধরন অনুযায়ী জীবাশ্ম কত প্রকারের হয়?

(b) জীবাশ্ম সংরক্ষণের শর্তগুলি কী কী?

(c) জীবাশ্মের নামকরণ কীভাবে করা হয়?

(d) জীবাশ্ম থেকে সম্পূর্ণ জীবদেহের পুনর্গঠন কীভাবে করা হয়?

(e) জীবাশ্ম অনুসন্ধানের গুরুত্ব কী?

উত্তরমালা

1. (a) (iii)
   (b) (i)
   (c) (i)
   (d) (iii)
   (e) (iv)
2. (a) 15.5 দ্রষ্টব্য
   (b) 15.6 দ্রষ্টব্য
   (c) 15.7 দ্রষ্টব্য
   (d) 15.8 দ্রষ্টব্য
   (e) 15.10 দ্রষ্টব্য

একক 16 ❑ ভূতত্ত্বীয় সময় সারণি ও ভূতত্ত্বীয় অতীতে বিভিন্ন উদ্ভিদের উৎপত্তি ও বিস্তার

গঠন

16.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

16.2 ভূতত্ত্বীয় সময় সারণি

16.2.1 আপেক্ষিক সময় সারণি

16.2.2 বিশুদ্ধ সময় সারণি

16.3 জীব বিবর্তনের ঘড়ি বা ক্যালেন্ডার

16.4 ভূতত্ত্বীয় অতীতে জীবাশ্মের অনুক্রম

16.5 সারাংশ

16.6 প্রশ্নাবলি

16.7 উত্তরমালা

16.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

যে কোনও ঘটনার অনুক্রম জানার জন্য সময়ের একটি মাপকাঠির দরকার হয়। সময় পরিমাপের একক হিসেবে সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাস, বছর প্রভৃতি আমাদের পরিচিত। অল্প সময়ের ব্যবধান পরিমাপের জন্য এগুলি ব্যবহার করা হয়, কিন্তু ভূবিজ্ঞানের ঘটনাবলির পরম্পরা নির্ণয়ে স্বাভাবিকভাবেই এই মাপকাঠি উপযোগী নয়। ভূবিজ্ঞানীদের ধারণা আজ থেকে প্রায় 460 কোটি বছর আগে পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল। কাজেই এর উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির অনুক্রম লক্ষ বা কোটি বছরের হিসেবে করা হয়। তাই পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়ের যে বিস্তার তাকে কয়েকটি সুবিধাজনক বিভাগে বিভক্ত করার প্রয়োজনেই ভূতত্ত্বীয় সময় সারণির অবতারণা।

উদ্দেশ্য : এই একক পাঠ করে আপনি

- ☐ জন্মাবধি আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বয়সকে কতগুলি সময় বিভাগে ভাগ করা হয়েছে তা জানতে পারবেন।
- ☐ বিভিন্ন সময় বিভাগে উদ্ভূত উদ্ভিদকুল সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন।
- ☐ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাওয়া জীবনের বৈচিত্র্য আর বিবর্তনের ধারাগুলি সম্পর্কে অবহিত হবেন।

16.2 ভূতত্ত্বীয় সময় সারণি

পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল প্রায় 460 কোটি বছর পূর্বে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত সময়কালকে কয়েকটি সময় বিভাগে ভাগ করা হয়েছে যা ভূতত্ত্বীয় সময় সারণি (Geological time scale)

ভূতত্ত্বীয় সময় মানদণ্ড একদিনে রচিত হয়নি। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পৃথিবীর শিলাস্তরগুলিকে

শিলা ও জীবাশ্মের ভিত্তিতে চারভাগে ভাগ করা হয়েছিল যার কার্যকারিতা খুব সীমিত ছিল। পরবর্তীকালে 'সুপারপজিসন তত্ত্ব' (Principle of Superposition), জীবাশ্ম গোষ্ঠীতত্ত্ব (Principle of Faunal Assemblage) প্রভৃতি ভূস্তরবিদ্যার মূলতত্ত্বগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সময় মানদণ্ড পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে।

এডাম সেজউইক্ ও রডরিক মার্চিসন (1830) সর্বপ্রথম বয়স অনুযায়ী স্তরানুক্রমে নামকরণ শুরু করেন। 1835 সালে এঁরা ব্রিটেনের ওয়েলশ অঞ্চলের পাললিক (Sedimentary) শিলাগুলিকে ক্যামব্রিয়ান (Cambrian) ও সিলুরিয়ান (Silurian) নামে বিভক্তি করেন। দুবছর পর সেজউইক আরও একটি নতুনতর স্তরের নাম ডেভোনিয়ান (Devonian) রাখেন, পরে কয়েকটি বিশেষ শিলাস্তরের অবস্থান নিয়ে দুই বন্ধু সেজইউক ও মার্চিসনের মধ্যে বিবাদ বাধে। ভূতত্ত্বীয় সময় সারণি রচনাকালে এই বিবাদ 'সেজউইক মার্চিসন বিবাদ' নামে পরিচিত। তাঁদের জীবদ্দশায় এই বিবাদের নিষ্পত্তি হয়নি। তাঁদের মৃত্যুর পর ওই সমস্যাযুক্ত স্তরগুলিকে অর্ডোভিসিয়ান (Ordovician) নামে একটি নতুন বিভাগে ফেলা হয়। প্রাচীনত্ত্বের দিক থেকে অর্ডোভিসিয়ান আগে হলেও সময় মানদণ্ডে এর প্রতিষ্ঠা অনেক পরে হয়েছে যা প্রমাণ করে সময় মানদণ্ডের বিকাশ ও পরিবর্ধন সুশৃঙ্খলভাবে হয়নি।

16.2.1 ভূতত্ত্বীয় সময় সারণি (Relative time scale)

এই সময় মানদণ্ডে পৃথিবীর গত 60 কোটি বছরের ঘটনা বা ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পাললিক শিলায় সংরক্ষিত সর্বপ্রাচীন, সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীত যে জীবাশ্ম পাওয়া যায় তা থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের বিভিন্ন জীবাশ্মের ক্রমপর্যায়ে আবির্ভাবের ওপর ভিত্তি করে এই সময় মানদণ্ড বা সারণি রচিত হয়েছে।

প্রাচীনত্বের দিক থেকে ভূতত্ত্বীয় সময় সারণিকে দুটি সুবিশাল মহাকল্প বা ইওন (Eon) যথা গুপ্তজীবী বা ক্রিপ্টোজোয়িক (গ্রিক Kryptos শব্দের অর্থ গুপ্ত বা গোপন) ও ব্যক্তজীবী বা ফ্যানারোজারিক (গ্রিক Phaneros এর অর্থ ব্যক্ত বা সুস্পষ্ট এবং Zoe কথার অর্থ জীবন) এ ভাগ করা হয়। এই মহাকল্পগুলি বিভিন্ন অধিকল্প বা এরায় (Era) বিভক্ত। প্রাণের প্রাচুর্য আর তার প্রমাণ হিসেবে সন্দেহাহীত জীবাশ্ম দেখা যায় প্রায় 60 কোটি বছর আগে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত সে সময়ের বিস্তার তাকে ব্যক্তজীবী মহাকল্প বলা হয়। গুপ্তজীবী মহাকল্পকে প্রাক্-কেমব্রিয়ান (Pre-cambrian) এবং আর্কিয়ান বা অ্যাজোয়িক (জীবনহীন) অধিকল্পের ভাগ করা হয়েছে। কেউ কেউ একে আর্কিওজোয়িক (জীবনোন্মেষ অবাত অণুজীবীয়) এবং প্রোটোরোজোয়িক (সবাত অণুজীবীয়) বিভাগে বিভক্ত করেছেন।

এই মহাকল্পের আগের প্রায় 400 কোটি বছর অর্থাৎ পৃথিবীর বয়সের প্রায় আশি শতাংশ সময় জুড়ে আছে গুপ্তজীবী মহাকল্প। এই মহাকল্প জীবনের উন্মেষ ও ক্রমবিকাশের এক দীর্ঘ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা আছে। তবে এদের প্রায় সবই অণুজীবাশ্ম যাদের শুধুমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই শনাক্ত করা সম্ভব। A

ব্যক্তজীবী মহাকল্পে জীবনের বৈচিত্র্য আর বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে একে তিনটি অধিকল্পে (Era) যথা পুরাজীবীয় (Palaeozoic), মধ্যজীবীয় (Mesozoic) ও নবজীবীয় (Caenozoic) ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি অধিকল্প একাধিক কল্পে (Period) বিভক্ত। কল্পগুলি ভূতাত্ত্বিক সময়ের মূল বিভাগ বলা চলে। মোট এগারটি কল্প চিহ্নিত আছে। পুরাজীবীয় অধিকল্পে কেমব্রিয়ান (Cambrian), অর্ডোভিসিয়ান (Ordovician), সিলুরিয়ান (Silurian), ডেভোনিয়ান (Devonian), কার্বনিফেরাস (Carboniferous)

সময়ের ব্যাপ্তি মিলিয়ন বছরের মাপে	আনুমানিক সময় মিলিয়ন বছরের মাপে					
Duration (m.y.)	Began (m.y.)ago	মহাকল্প (Eon)	অধিকল্প (Era)	কল্প (Period)	উপকল্প (Epoch)	উল্লেখযোগ্য ভূতত্ত্বীয় ঘটনাবলি ও বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর আবির্ভাব, বিকাশ ও বিলুপ্তি
Last 5.000 years		ব্যক্তজীবী (PHANEROZOIC)	নবজীবীয় (CENOZOIC)	কোয়াটারনারি (QUATERNARY)	অধুনা (RECENT/HOLOCENE)	আধুনিক উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল।
25					প্লাইস্টোসিন (PLEISTOCENE)	মহাদেশীয় হিমবাহের অগ্র-পশ্চাৎ সঞ্চালনের ফলে উদ্ভিদকুলের পুনর্বিন্যাস। উলি ম্যামথ্ ও বাইসনের উপস্থিতি। আধুনিক মানুষের আবির্ভাব।
4.5	25-			টারসিয়ারি (TERTIARY) — উচ্চ টারসিয়ারি (NEOCENE)	প্লায়োসিন (PLIOCENE)	আন্দিস প্রভৃতি পর্বতের উচ্চতাবৃদ্ধি জনিত আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে তৃণভূমির সৃষ্টি। হাতি, উট, ঘোড়ার উপস্থিতি।
19	7-				মায়োসিন (MIOCENE)	পৃথিবীব্যাপী মহাদেশীয় ভূখণ্ডের সঞ্চালনের ফলে আল্পস, হিমালয় প্রভৃতি পর্বতের উচ্চতা বৃদ্ধি। তাপমাত্রার হ্রাস।
12	26-			নিম্ন টারসিয়ারি (PALAEOCENE)	অলিগোসিন (OLIGOCENE)	মৃদু ঠাণ্ডা আবহাওয়া। উচ্চ অক্ষাংশ জায়গায় মেটাসিকোয়া সারসিডিফাইলামের উপস্থিতি। বেড়াল, কুকুর ও জলহস্তীর আবির্ভাব।
16	38-				ইয়োসিন (EOCENE)	নাতিশীতোষ্ণ, আর্দ্র আবহাওয়ায় উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ঘন অরণ্যের সৃষ্টি। প্রায় সবরকমের আধুনিক উদ্ভিদের উপস্থিতি। ঘোড়ার আবির্ভাব।
11	54-				প্যালিওসিন (PALEOCENE)	ম্যাগনোলিয়েসী, লরেসী ও জাগ্‌লানডেসি গোত্রভুক্ত গুপ্তবীজী উদ্ভিদের প্রাচুর্য।
76	64-		মধ্যজীবীয় (MESOZOIC)	ক্রীটেশান (CRETACEOUS)	উচ্চ	নিম্ন ক্রীটেশাসে প্রথম সপুষ্পক গুপ্তবীজী উদ্ভিদের উন্মেষ। একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। প্রথম আমরা যুক্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী। ডাইনোসরের বিলুপ্তি।
					নিম্ন	
54	141-			জুরাসিক (JURASSIC)	উচ্চ	মৃদু আবহাওয়া। গিংগো, কনিফার, সাইকাস্ সাইকাডিয়য়েডের প্রাচুর্য। উচ্চশ্রেণির পতঙ্গ ও পাখির বিকাশ। ডাইনোসরের প্রাচুর্য।
					মধ্য	
					নিম্ন	
30	195-			ট্রায়াসিক (Triassic)	উচ্চ	শুষ্ক আবাহওয়া। সাইকাস ও গিংগো জাতীয় উদ্ভিদের বিকাশ। গ্লসপ্‌টেরিসের সংখ্যা হ্রাস। ডাইনোসরের বিকাশ প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণী।
					মধ্য	
					নিম্ন	
55	255-		পুরাজীবীয় (PALEOZOIC)	পারমিয়ান (PERMIAN)	উচ্চ	দক্ষিণ গোলার্ধে ঠাণ্ডা ও শুষ্ক আবহাওয়া। গ্লসপ্‌টেরিস, জাতীয় উদ্ভিদের বিকাশ। বৃক্ষরূপ লাইকোপড ও স্ফেনপ্‌সিডের বিলুপ্তি।
					নিম্ন	
45	280-			কার্বনিফেরাস (CARBONIFEROUS) — পেনসিলভিনিয়ান (PENNSYLVANIAN)	উচ্চ	উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় জন্মানো মস, লাইকোপড, স্ফেনপ্‌সিড ফার্ণজাতীয় উদ্ভিদ। কনিফারের উৎপত্তি।
					মধ্য	
					নিম্ন	
20	325-			মিসিসিপিয়ান (MISSISSIPPIAN)	উচ্চ	উষ্ণ আবহাওয়া। আদি ফার্ণ, বীজবাহী ফার্ণ, বৃক্ষরূপ লাইকোপড ও ক্যালামাইটের প্রাচুর্য। ডানাযুক্ত পতঙ্গের উৎপত্তি।
					নিম্ন	
50	345-			ডেভোনিয়ান (DEVONIAN)	উচ্চ	আর্দ্র ও শুষ্ক আবহাওয়া। সপুষ্পক গুপ্তবীজী উদ্ভিদ ছাড়া সবরকম সংবহনকলা যুক্ত উদ্ভিদের বিকাশ। কিছু উদ্ভিদে অসমরেণুপ্রসূতা ও বীজ বাহীতার প্রকাশ। লিভারওয়ার্ট ও ছত্রাক। মাছের বিকাশ। প্রথম উভচর।
					মধ্য	
					নিম্ন	
40	395-			সিলুরিয়ান (SILURIAN)	উচ্চ	মৃদু উষ্ণ আবহাওয়া। সংবহন কলাযুক্ত স্থলজ উদ্ভিদের আবির্ভাব। প্রথম শ্বাসযন্ত্রযুক্ত প্রাণী, ব্রাকিওপেড ও কোরাল।
					নিম্ন	
65	435-			অর্ডোভিসিয়ান (ORDOVICIAN)	উচ্চ	মৃদু উষ্ণ আবহাওয়া। সবুজ ও লোহিত শৈবালের প্রাচুর্য। প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণী। গ্লাপটোলাইট, নটিলয়েড প্রভৃতি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রাচুর্য।
					নিম্ন	
70	500-			কেমব্রিয়ান (CAMBRIAN)	উচ্চ	উষ্ণ আবহাওয়ায় সমুদ্র জলে নীলাভ সবুজ, সবুজ ও লোহিত শৈবালের প্রাচুর্য্য। সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রাচুর্য। প্রথম ট্রাইলোবাইট ও ফোরমিনিফেরা।
					মধ্য	
	570-				নিম্ন	
4,130	4700-	গুপ্তবীজী (CRYPTOZOIC)	প্রাক্‌কেমব্রিয়ান ও আর্কিয়ান (PRECAMBRIAN ARCHAEAN)			উষ্ণ আবহাওয়া; ব্যাকটেরিয়া, নীলাভ সবুজ, ও লোহিত শৈবাল। পৃথিবীর জন্ম।

চিত্র 16.1 আন্তর্জাতিক ভূ-তত্ত্বীয় সময়সারণি ও বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ও বিকাশ

ও পারমিয়ান (Permian) নামে ছয়টি কল্প। মধ্যজীবীয় অধিকল্পে ট্রায়াসিক (Triassic), জুরাসিক (Jurassic), ক্রীটেশাস (Cretaceous) নামে তিনটি কল্প এবং নবজীবীয় অধিকল্পে টার্শিয়ারি (Tertiary) ও কোয়াটারনারি (Quaternary) নামে দুটি কল্প বর্তমান। এই কল্পগুলি আবার বিভিন্ন উপকল্পে (Epoch) বিভক্ত (চিত্র : 16.1)

16.2.2 বিশুদ্ধ সময় সারণি (Absolute time scale)

সরাসরি বছরের মাপে পৃথিবীর বয়স বা পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের বয়স নির্ধারণ করে যে সময় সারণি প্রস্তুত করা হয় তা হল বিশুদ্ধ সময় সারণি। এইভাবে ভূস্তরের বয়স নির্ধারণের প্রচেষ্টা উনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছে। সর্বপ্রথম একজন ইংরেজ ভূবিদ ব্যাড্‌লি পলিমাটির (sediments) অবক্ষেপণিক হারের (depositional rate) সঙ্গে শিলাস্তরের মোট বেধ (thickness) গুণ করে কেমব্রিয়ান থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সময়ের বিস্তার প্রায় 75 কোটি বছর স্থির করেন। আসল বয়সের সঙ্গে এই বিরাট তফাতের কারণ হল যে তিনি শিলাস্তরের গাঠনিক অসঙ্গতি বা ছেদ (unconformity) গুলিকে হিসেবের মধ্যে ধরেননি। পরবর্তীকালে একজন আইরিশ ভূবিদ জলি সমুদ্রজলে লবণতার হার মেপে সমুদ্রের বয়স প্রায় 9.5 কোটি বছর স্থির করেন। প্রতি বছর সমুদ্রজলে লবণতা বৃদ্ধির হার জানা থাকলে আদি সমুদ্রের শূন্য লবণতা থেকে বর্তমান সমুদ্রের লবণতা আসতে এরকম সময় লাগারই কথা। অগ্রদূত হিসেবে এই ভূবিদদের উদ্ভাবনী শক্তি প্রশংসনীয় কিন্তু গৃহীত অঙ্গীকারগুলি ত্রুটিপূর্ণ থাকায় এঁরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেননি। এরপর লর্ড কেলভিন ভূতাপের ক্রমবৃদ্ধির হার মেপে পৃথিবীর বয়স 2-3 কোটি বছর নির্ণয় করেন। বস্তুত তাঁর হিসেব নির্ভুল হলেও অঙ্গীকার ভুল থাকায় এই হিসাব স্থায়ী হয়নি। তাঁর ধারণা ছিল পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ তাপ পৃথিবীর গরম অবস্থায় উৎপত্তির জন্য। যেহেতু তখনও তেজস্ক্রিয়তা (Radioactivity) আবিষ্কৃত হয়নি পৃথিবীর অভ্যন্তরেই যে তার নিজস্ব তাপজননের প্রক্রিয়া আছে তা কেলভিনের অজানা ছিল।

গাঠনিক অসঙ্গতি ভূস্তরের অবক্ষেপ কোথাও অবিচ্ছিন্ন হয়নি। তারা একাধিক ছেদ বা অবক্ষেপ বিরতি বিভক্ত। এই বিরতিকে গাঠনিক অসঙ্গতি বলে।

তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বয়স নির্ধারণে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। ভূস্তরে তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ (radioactive elements) সম্বলিত অনেক খনিজ পদার্থ (mineral) আছে। এই খনিজ পদার্থগুলি কেলাসিত (crystallisation) হবার সময় মৌলিক পদার্থগুলি এর মধ্যে অঙ্গীভূত হয়। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এদের ভাঙ্গানের সাহায্যে বয়স নির্ধারণ করা হয়। এই মৌলিক পদার্থগুলির পারমাণবিক নিউক্লিয়াইগুলি অস্থির (unstable) থাকায় এরা নিয়মিত ভাবে এক বিশেষ হারে সুস্থির (stable) মৌল পদার্থে ভেঙে যায়। যেমন চাপ, তাপ ও অন্যান্য অবস্থা উপেক্ষা করে ইউরেনিয়াম অত্যন্ত শ্লথ হারে সীসা (Lead) ও হিলিয়ামে পরিণত হয়। এক গ্রাম ইউরেনিয়াম প্রতি দশ লক্ষ বছরে (1 মিলিয়ন) ভেঙে 1/7000 গ্রাম সিসায় পরিণত হয়। সুতরাং কোনো শিলায় যদি ইউরেনিয়াম সিসার অনুপাত নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায় তাহলে ওই শিলার প্রকৃত বয়স নির্ধারণও সম্ভব। স্বাভাবিকভাবেই সেই শিলাস্তরে যদি কোনো জীবাশ্ম থাকে তাহলে তার বয়সও নির্ধারিত হয়ে যায়। এভাবেই আপেক্ষিক ভূতত্ত্বীয় সময় সারণির পাশাপাশি

1896 সালে হেনরি বেকেরেল তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন। 1900 সালে ক্যুরি দম্পতি পিচব্লেন্ড থেকে সর্বপ্রথম রেডিয়াম নিষ্কাশন করেন।

বিশুদ্ধ সময়ের হিসেব দেওয়া সম্ভব হয়েছে (চিত্র : 16.1)। উত্তরোত্তর গবেষণার ফলে এই সময় মানদণ্ডের প্রতি নির্ভরশীলতা বাড়ছে।

তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল এদের অর্ধজীবন (half life) যা বিভিন্ন সময় নির্ধারণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্ধজীবন হল একটি নির্দিষ্ট সময় যার মধ্যে একটি অস্থির খনিজ পদার্থের মূল পরিমাণের অর্ধেক ক্ষয় হয়ে বাকি অর্ধেক অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং এরকম কোন খনিজের প্রথম অর্ধজীবন পর মূল পরিমাণের ½ অবশিষ্ট থাকবে, দ্বিতীয় অর্ধজীবন ¼ পর অংশ, তৃতীয় অর্ধজীবন পর ⅛ অংশ অবশিষ্ট থাকবে। প্রতিটি তেজস্ক্রিয় পদার্থের নিজস্ব অর্ধজীবন আছে। যেমন ইউরেনিয়াম 235 অর্ধজীবন 713 মিলিয়ন বছর (1 মিলিয়ন = 10 লক্ষ বছর)। কোনও নমুনাতে যদি 50 শতাংশ ইউরেনিয়াম 235 এবং বাকি 50 শতাংশ সুস্থির অবশেষ লেড্ 207 (সিসা) পাওয়া যায় তাহলে নমুনাটির বয়স হবে 713 মিলিয়ন বছর। যদি দেখা যায় 25 শতাংশ ইউরেনিয়াম 235 এবং 75 শতাংশ লেড্ 207 অবশিষ্ট আছে তাহলে বুঝতে হবে তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াসটি দুটি অর্ধজীবন অতিক্রম করেছে এবং নমুনাটির বয়স হবে 1426 মিলিয়ন বছর (চিত্র : 16.2)।

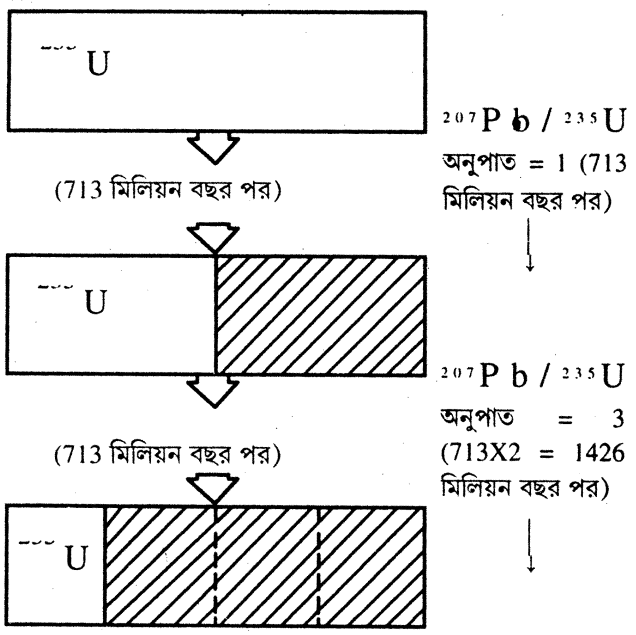

চিত্র : 16.2 তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের ফলে ইউরেনিয়াম 235 (^{235}U) থেকে সিসা 207 (^{207}Pb) এর উৎপত্তি

যে সব আইসোটোপের অর্ধজীবন অনেক বেশি তাদের সাহায্যে অনেক প্রাচীন বয়স নির্ধারণ করা যায়। ইউরেনিয়াম (U-235 : অর্ধজীবন 713 মিলিয়ন বছর; U-238 : অর্ধজীবন 4510 মিলিয়ন বছর), পটাশিয়াম (পটাশিয়াম 40 - আরগন 40 : অর্ধজীবন 1300 মিলিয়ন বছর), রুবিডিয়াম (রুবিডিয়াম 87-স্ট্রনসিয়াম 87 : অর্ধজীবন 47000 মিলিয়ন বছর) প্রভৃতি পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে প্রাচীন ভূস্তর ছাড়াও বহির্বিশ্ব থেকে আসা উল্কার বয়স এমনকি চাঁদ থেকে আনা শিলার বয়সও নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।

উপরিউক্ত আইসোটোপগুলির তুলনায় কারবন - 14 আইসোটোপের অর্ধজীবন খুব কম (5730 বছর)। ফলে কয়েকটি অর্ধজীবন পার হওয়ার পর সংরক্ষিত জৈব পদার্তে (উদ্ভিদ বা প্রাণী) C-14 আর পরিমাপযোগ্য অবস্থায় থাকে না। তাই 50,000 বছর বা তার বেশি বয়সের জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণ এই পদ্ধতির দ্বারা নির্ভুলভাবে করা যায় না। সাম্প্রতিক ভুতত্ত্বীয় ঘটনাবলি বিশেষ করে কোয়াটারনারি কল্পের শেষ ভাগে ঘটে যাওয়া তুষার, প্লাবন, সামুদ্রিক তলের পরিবর্তন, জীবের বিস্তার ইত্যাদির নির্ধারণে এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় এই পদ্ধতির ব্যবহার অপরিহার্য।

16.3 জীব বিবর্তনের ঘড়ি বা ক্যালেন্ডার

ভূতাত্ত্বিক সময়ের হিসেবে প্রাণের উন্মেষ বিকাশের অনুক্রম একনজরে দেখে নেবার জন্য পৃথিবীর সৃষ্টিকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত সময়ের বিস্তারকে একটি বার্ষিক ক্যালেন্ডার বা ঘড়ির মতো রূপ দেওয়া হয়েছে। নববর্ষের প্রথম মুহূর্তে যদি পৃথিবীর সৃষ্টি হয়ে থাকে, প্রথম প্রাণ ও জীবের উন্মেষ হয় মার্চের শেষে এবং সাগরজলে এদের বিকাশ চলতে থাকে নভেম্বর পর্যন্ত। নভেম্বর শেষ সপ্তাহে প্রথম স্থলভাগে জীবের প্রসার ঘটে। এই ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আধুনিক মানুষের আবির্ভাব ঘটে 31 ডিসেম্বর সায়াহ্নে (চিত্র : 16.3)।

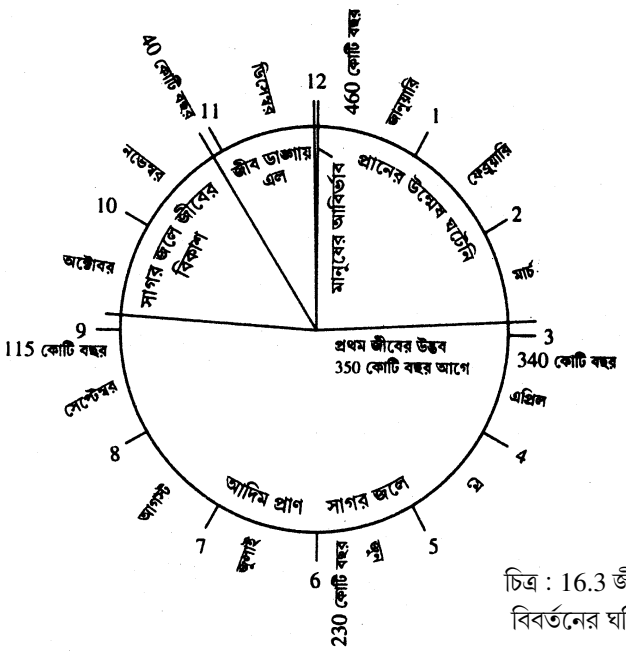

চিত্র : 16.3 জীব বিবর্তনের ঘড়ি

16.4 ভূতত্ত্বীয় অতীতে জীবাশ্মের অনুক্রম

প্রায় 460 কোটি বছর আগে পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের জীবের সৃষ্টি ও বিকাশ হয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিলুপ্ত হয়ে গেছে কেউ বা নতুন পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে আজও টিকে আছে। এই পাঠ্যাংশে আমরা সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে শুধুমাত্র উদ্ভিদকুলের বৈচিত্র্য ও তার পরিবর্তন আলোচনা করব।

পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার কীভাবে হয়েছে তা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। কেউ কেউ মনে করেন বহির্বিশ্ব থেকে উল্কা বা ধূলিকণার সাথে প্রাণ এসেছে। অনেকের মতে এই পৃথিবীর পরিমণ্ডলেই প্রাণের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ হয়েছে। এঁদের মতে আদি পৃথিবীর পরিমণ্ডলে ছিল হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, মিথেন, অ্যামোনিয়া ও জলীয় বাষ্পের প্রাচুর্য। এইসব গ্যাসের মিশ্রণে আকাশের বিদ্যুৎ পাতে তৈরি হয়েছিল নিউক্লিক অ্যাসিডের মূল উপাদানগুলি যা সাগরজলে ঘনীভূত হয়। ক্রমে অজৈব প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত এই জৈব উপাদনগুলি থেকে আদি এককোষী জীবের জন্ম হয়। মুক্ত অক্সিজেন না থাকায় এই বর্ণহীন অবাত অনুজীবীরা রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণ করত। পরে কিছু কিছু অনুজীবী নিজেদের খাবার নিজেরা তৈরি করতে শুরু করল। ক্লোরোফিল ঘটিত এই সালোকসংশ্লেষের ফলে প্রচুর মুক্ত অক্সিজেন জল ও বাতাসকে সম্পৃক্ত করে তুলল। এরপর ধীরে ধীরে তৈরি হল ওজোন গ্যাস (O_3) স্তর। ক্রমে এই ওজোনস্তরে ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি ও অন্যান্য মহাজাগতিক রশ্মি আটকে পড়ায় জল ও স্থলভাগ উন্নততর জীবের বাসযোগ্য হল।